

আজি হতে হাজার বছর আগে

আরিফ আজাদ

মুকুন
পাবলিশিং

মহানতি বুয়াথশাঁ,

আমার সম্মানিত ভ্রাতা, কেমন আছেন আপনি? মনে হচ্ছে কতো যুগ ধরে আপনাকে আমি দেখি না। সম্ভান লাভের সংবাদ সমেত আপনি আমার জন্য কালো গোলাপের যে চারা উপহার হিসেবে পাঠিয়েছেন, তা আমি সাদরে গ্রহণ করেছি। গোলাপ যে আমার খুব প্রিয় ফুল, তা আপনি মনে রেখেছেন দেখে আমি যারপরনাই আনন্দিত। গোলাপের এই দুর্লভ জাত আপনি কোথায় পেয়েছেন?

পরমসম্মান, প্রিয় ভ্রাতা আমার, আপনাকে আমি রাজদরবারে জরুরি তলব করছি। একটা ব্যাপারে আপনার সাথে পরামর্শ করা খুব দরকার। আপনি হয়তো জেনে থাকবেন, ইস্পাহান নগরীতে খ্রিস্টধর্ম নামে নতুন এক ধর্মের আগমন ঘটেছে। জানা গেছে, সিরিয়া অঞ্চল থেকে কিছু সাধু সন্ন্যাসী এসে ইস্পাহান নগরীতে এই ধর্ম প্রচার করছে। শুরুতে তাদের ব্যাপারে আমার কোনো আগ্রহ না থাকলেও, এখন মনে হচ্ছে ধীরে ধীরে তারা শক্তিশালী হয়ে উঠছে। ধারণা করছি, আগামী দিনে তারা আমার জন্য বড় রকমের মাথা ব্যথার কারণ হবে। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে তাদের অনুসারীর সংখ্যাও নাকি বাড়ছে ফসে। আমাদের পিতৃধর্ম থেকে মানুষকে বিচ্যুত করে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষিত করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য হতে পারে। ব্যাপারটা নিয়ে আগামী শুক্রবার আমি রাজ বৈঠক ঘোষণা করেছি। সেই বৈঠকে আমার অন্যতম পরামর্শদাতা হিসেবে আপনার উপস্থিতি আমাকে সম্মানিত করবে।

ইতি,
আপনার প্রিয় ভাই
পারস্যের অধিপতি



একটি সাদা ঘোড়া প্রস্তুত করা হলো। এই ঘোড়ায় চেপে বুয়াখশাঁ পারস্য রাজ দরবারে উপস্থিত হবে। দূরের যাত্রায় সাদা ঘোড়াতে চেপে বেরুনোটা এই অঞ্চলের সুপ্রাচীন সংস্কৃতির অংশ। সাদা রঙটাকে তারা শান্তি আর নির্বিঘ্নতার প্রতীক বলে বিশ্বাস করে। সাদা বাহনে দূরের যাত্রাও শান্তিপূর্ণ আর নির্বিঘ্ন হবে—এমন বিশ্বাস থেকেই এই রীতির প্রচলন।

যাত্রা আরম্ভ করার আগে আগুনের মণ্ডপের কাছে এসে দাঁড়াল বুয়াখশাঁ। মাজুসিদের গৃহের অভ্যন্তরে সর্বদাই মণ্ডপ প্রজ্বলিত রাখা হয়। এই আগুনকে কোনোভাবেই নিভতে দেওয়া হয় না। বুয়াখশাঁ আগুনের কাছাকাছি এসে হাত দুখানা জোড় করে বুকের কাছাকাছি আনল। তার চোখজোড়া বন্ধ। ঠোঁট দুটো বিড়বিড় করে নড়ছে। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মাহবা। বাবার মতো সে-ও তার দুখানা হাত জোড় করে বুকের কাছে এনে রাখল। ঠোঁট নড়ছে তারও।

চোখ মেলে পাশে ছেলেকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বুয়াখশাঁ যারপরনাই আনন্দিত হলো। খুশিতে চকচক করে উঠল তার চোখ। বুয়াখশাঁর খুব ইচ্ছে, তার ছেলে সারাজীবন ধর্মকর্ম নিয়েই থাকবে। একদিন সে হয়ে উঠবে মাজুসি গোত্রের প্রধান পুরোহিত। আগুন দেবতার উপাসনায় নিজেকে সঁপে দেবে মাহবা।

বুয়াখশাঁ মাহবাকে উদ্দেশ্য করে বলল,

‘সোনা বাবা, ঈশ্বরের কাছে তুমি কি চাইলে বলো তো?’

মাহবা চোখ মেলে বাবার দিকে তাকাল। তারপর বলল,

‘আমি বলেছি, তিনি যেন আমাকে সত্যিকার ঈশ্বরের খোঁজ পাইয়ে দেন।’

যেন চমকে উঠল বুযাখশাঁ। এ কী বলল মাহবা! কী ঘোর অকল্যাণের কথা মুখ থেকে বেরল তার! সত্য ঈশ্বরের খোঁজ? যে আগুন ঈশ্বরের উপাসনা পৈতৃক সূত্রে বুযাখশাঁরা যুগের পর যুগ, কালের পর কাল, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে করে আসছে, তা কি মিথ্যা? আগুনের এই তেজ, ভস্ম করে দেওয়ার এই যে ক্ষমতা—এসব কি সত্য ঈশ্বরের গুণাবলি নয়? কেন আগুনের দেবতাকে সত্য ঈশ্বর বলে মনে হলো না মাহবার? তার কিশোর হৃদয়ে কে জাগিয়ে দিল এমন অশুভ চিন্তা?

এমনই মন অশান্ত করে তোলা কতিপয় ভাবনা মুহূর্তে এফোঁড়-ওফোঁড় করে গেল বুযাখশাঁকে। বড্ড অস্থির লাগছে তার। ছোট্ট মাহবার এই কথা যেন তাকে ফেলে দিয়েছে এক অথৈ জলের সমুদ্রে। এক ঘোর অমঙ্গলের ঘণ্টাধ্বনি যেন তার বুকের কোথাও ধুকধুক করে বাজতে শুরু করেছে।



পারস্য রাজ দরবারের সামনে যখন বুযাখশাঁর সাদা ঘোড়া এসে থামল, তখন দুপুর গড়িয়ে গেছে। পশ্চিমের কোলে হেলে পড়েছে দিনের সূর্য। সম্রাটের আদেশে সাতজন সেনা প্রহরী বুযাখশাঁকে সাদর আমন্ত্রণ জানাতে জানাতে ভিতরে নিয়ে গেল। সদর দরোজায় বুযাখশাঁর গায়ে এসে পড়ল গোলাপের সুরভি মিশ্রিত সুগন্ধী জল। খুব গুরুত্বপূর্ণ রাজ অতিথিদের কপালেই এমন অভ্যর্থনা জুটে। বুযাখশাঁ গুরুত্বপূর্ণ কেউ নয়, তবে সে সম্রাটের নিকটাত্মীয় এবং সম্পর্কে ভাই। তারচেয়ে বড় কথা—বুযাখশাঁ মাজুসি গোত্রের প্রধান। ধার্মিকতায় বুযাখশাঁর জুড়ি মেলা ভার। সারা ইম্পাহান নগরীতেই বুযাখশাঁর ধার্মিকতার নামডাক ছড়িয়েছে। মানুষের মুখে মুখে পাওয়া যায় বুযাখশাঁর প্রশংসা। বুযাখশাঁকে ঘিরে সম্রাটের ভালোবাসার এটাও প্রধান একটা কারণ।



সে রাতে মাহবা দু'চোখের পাতা এক করতে পারল না। চোখে একফোঁটা ঘুম নেই, তবু কী এক আশ্চর্য সুন্দর স্বপ্নের মাঝে তলিয়ে গেল সে! খাঁচার মাঝে বন্দি পাখি যেভাবে প্রাণ প্রকৃতিতে হারানোর জন্য ছটফটায়, মাহবাও সেরকম ছটফট করত ঘরে। ভোরের শিশির, সকালের নরোম কোমল রোদ, ঝিরিঝিরি বাতাসে নড়ে নড়ে উঠবে বাঁশের পাতা, মাথার উপর দিয়ে উড়ে যাবে শালিকের দল, চারদিকে থাকবে দলছুট ফড়িঙ, ফুলের গায়ে পরম মমতায় বসে থাকবে লাল নীল প্রজাপতি, সমস্ত আকাশ উন্মুক্ত হয়ে যাবে মাহবার জন্য—আহা, কী আনন্দ!

মাহবা সৃষ্টিকর্তাকে কৃতজ্ঞতা জানায়। কতো দ্রুত তিনি মাহবার মনের যন্ত্রণা দূর করে দিলেন!

বাইরে যাবার আনন্দে মাহবা সারারাত একটুও ঘুমোতে পারল না। এ-পাশ ও-পাশ করে কাটিয়ে দিলো সবটা সময়। বাইরে এখনো নিকষ কালো অন্ধকার, তবু মাহবার কানে যেন এসে লাগছে পাখিদের কলকাকলি। শিশিরভেজা ঘাসে হেঁটে বেড়ানোর যে স্নিগ্ধ অনুভূতি—মাহবা যেন কল্পনায় তা অনুভব করতে পারছে। রাত পেরিয়ে একসময় ভোরের কোমল সূর্যরশ্মিতে ভরে উঠল চারপাশ। মাহবা হুড়মুড় করে উঠে পড়ল বিছানা ছেড়ে।

বাড়ির বাইরে পা রাখতেই আনন্দে মাহবার মন পরিপূর্ণ হয়ে গেল। মুক্ত বিহঙ্গের মতো ডানা মেলে উড়ে উড়ে বেড়াতে ইচ্ছে করল তার। আহা, কী বিশাল মাথার উপরের এই সুবিস্তৃত আকাশ! চারপাশে রাশি রাশি আলো। স্নিগ্ধ বাতাসে যেন গা জুড়িয়ে আসে। প্রাণ-প্রকৃতির এই মনোরম ঐশ্বর্য মাহবার কাছে স্বপ্নের মতো লাগছে। কী সুন্দর সৃষ্টিকর্তার এই দুনিয়া!

তাদের গ্রাম থেকে দুই গ্রাম পরে জোরায়েল অঞ্চল। মাঝখানে কবীলা নামে একটা জায়গা আছে যা ঘন গাছপালায় পরিবেষ্টিত। দূর থেকে দেখলে যদিও গভীর অরণ্য বলে মনে হবে, তবে ঠিক অরণ্য নয় এটা। থেকে থেকে আছে মানুষের ঘরবাড়ি, আবাদি জমি, পথঘাট ইত্যাদি। চারপাশে সারি সারি পাইন, বাবলা, মেহগনি গাছ। তার ঠিক মাঝখান দিয়ে চলাচলের রাস্তা। ভারি সুন্দর এই জায়গাটা!

কবীলার পথ ধরেই এগুচ্ছিল মাহবা। তার চোখ ছড়িয়ে আছে চারপাশে। পাখিদের অবিশ্রান্ত কিচিরমিচির শব্দে যেন সবদিকে পড়ে গেছে সাড়া। কতো হাজার, সহস্র পাখিরা একসাথে ডেকে চলেছে কে জানে! মাহবা নিজের মতো করে হাঁটছে। কতদিন পর এই ধুলোমাখা পথে তার বিচরণ! কতদিন পর পাখিদের অবাধ গুঞ্জরণ, পত্রপল্লবে সবুজের ঢেউ দেখে চোখ জুড়াচ্ছে আর ঝিরঝিরি বাতাসের দোলা এসে গায়ে লাগছে তার! এই অনির্ণেয় আনন্দকে মাহবা হারাতে চায় না। উপভোগ করতে চায় মন ভরে।

সবকিছু চলছিল ঠিকঠাক মতোই। কবীলার অপরূপ সৌন্দর্য দেখতে দেখতেই এগুচ্ছিল মাহবা। কিন্তু হঠাৎ এক কোমল আওয়াজে মোহভঙ্গ হলো তার। এমন কিছু শব্দ মাহবার কানে এসে লাগল যা ঠিক পাখিদের কলরব নয়। কোনো প্রাণীর শব্দও এরকম হয় না।

আওয়াজের উৎসস্থল খুঁজে পাওয়ার আশায় মাহবা তাকাল চারদিকে। কিন্তু হয়, এই নিবিড় অরণ্যে গাছগাছালি ও পাখিদের কূজন ছাড়া আর কোনোকিছু চোখে পড়ল না। তবে, ভুল কিছু শুনল সে? আনন্দের আতিশয্যে মস্তিষ্কে তৈরি হওয়া কোনো বিভ্রম?

ঠন...ঠন...ঠন

না না। ভুল তো নয়। এই যে এইমাত্র আরও একবার মাহবার কানে এসে লাগল সেই আওয়াজ। এবার তো সে কোনো ঘোরের মধ্যে ছিল না। এখন যে আবারও স্পষ্ট শুনতে পেল সেই শব্দ। এ কীসের আওয়াজ? ভালোভাবে শোনার চেষ্টা করল মাহবা। কবীলার উত্তর দিকটাতে গাছগাছালির আধিক্য রয়েছে। মাহবা খেয়াল করে দেখল, এই অদ্ভুত আওয়াজটা সেই ঘন

গাছপালা বেষ্টিত উত্তর দিক থেকেই আসছে। নিজের পথ ছেড়ে মাহবা সেদিক পা বাড়ায়। এই আওয়াজের রহস্য ভেদ করতে না পারলে মাহবার কিশোর মনের কৌতূহল যে কোনোভাবেই কাটবে না।

শুকনো শাল পাতার মর্মর শব্দ মাড়িয়ে এগুচ্ছে মাহবা। যত এগুচ্ছে শব্দটা যেন আরও বেশি করে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। একটা কোমল কিন্তু অবিশ্রান্ত শব্দের ফোয়ারা। শুনতেও ভারি সুন্দর! এমন চিত্তহারী ও মর্মভেদী শব্দ-ঝংকার আগে কখনোই শুনেনি মাহবা।

মাহবাকে খুব বেশিদূর এগুতে হলো না। আধা ক্রোশ মতো পথ হাঁটার পরে সে এসে দাঁড়াল এক অতি আশ্চর্য দুনিয়ার সামনে। জগতে এতো রহস্য আর সৌন্দর্য লুকিয়ে আছে তা কে জানত! মাহবা দেখল, অতিশয় গাছপালায় আচ্ছাদিত একটা জায়গাতে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে একটি সুন্দর সৌষ্ঠব দালান। বর্ষার ফলার মতো এর অগ্রভাগ। দালানের গায়ের কারুকাজ এতো সুন্দর যে চোখ ফেরানো দায়! এ ঘটনা যেন বড় আকস্মিক, বড় অপ্রত্যাশিত!

চারপাশে সারি সারি শাল গাছ। শালের পাতায় আচ্ছাদিত পথ। এই অতি মনোরম দালানের কাছে যেতে হলে এই শাল পাতার বিছানা মাড়িয়ে যেতে হবে। একটা অদ্ভুত ভালো লাগায় ভরে উঠল মাহবার মন।

এই দালানে কারা থাকে, কী তাদের পরিচয় আর পেশা—এসবের কোনোকিছুই মাহবা জানে না। কিন্তু এক অদৃশ্য শক্তি যেন মাহবাকে সেদিকে টানছে। মাহবা ভুলে গেল তার পরিবারের কথা, জোরায়েলে জমি দেখতে যাওয়ার বিষয়টাও মাথা থেকে হাওয়া হয়ে গেছে তার। কবীলার ঘন অরণ্যে ঘেরা এই অদ্ভুত দালানের কাছে এসে যেন মাহবা এক আশ্চর্য বাঁধনে আটকা পড়ে গেল।

মাহবা এগুচ্ছে দালানটা লক্ষ করে। তার পদতলে চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে শালের পাতা। শাল পাতার মর্মর ধ্বনি যেন বাতাসে একটা চাপা গুঞ্জন তৈরি করেছে। প্রকৃতির কোথাও যেন ভাঙনের সুর; অথবা—গড়ে উঠার প্রথম প্রস্তুতি।

অদ্ভুত! মন যা চায়, হৃদয় যা খুঁজে তা লাভের জন্য সে ছিন্ন করে ফেলতে পারে মায়ার সকল বাঁধন।

মাহবা জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল। আকাশে মেঘ নেই। জোসনার নরোম আলোয় একটি আলো-আঁধারির পরিবেশ তৈরি হয়ে আছে জগৎজুড়ে। দূরের আকাশে মিটিমিটি করে জ্বলছে একটি তারা। তারাটিকে মাহবার বড় আপন বলে মনে হলো। সেই তারাটিও যেন তার মতোই—ভালোবাসায় বেষ্টিত তবু ভীষণ একা।

ছোটবেলার স্মৃতিগুলো যেন হুড়মুড় করে ভিড় জমায় মনের ক্যানভাসে। আগুনের মণ্ডপের পাশে তার বেড়ে উঠার সেই দিনগুলো যেন ধোঁয়ার মতো পাক খেতে খেতে হারিয়ে যাচ্ছে অসীম আকাশে। মাহবার মনে পড়ে, রোজ যখন গোখুলি নামত, মা তার মাথায় তেল দিয়ে দিতেন নিয়ম করে। চৌকাঠে জ্বালানো ধূপের ধোঁয়া এসে জড়িয়ে যেত মায়ের চুলে। পুজোর ঘর থেকে ভেসে আসত বাবার কণ্ঠস্বর। তামার পাত্রে আগুন জ্বালিয়ে তিনি একমনে জপতেন আগুন দেবতার মন্ত্র। আগুনের সেই লালচে আভা এসে পড়ত ছোট্ট মাহবার চেহারায়। যেন এই আগুন তাকে চেনে। যেন এই আগুন তাকে ভালোবাসে।

এত প্রগাঢ় ভক্তি, প্রেম আর ভালোবাসা দেখতে দেখতে বড় হয়েছে মাহবা, তবুও কেন তার মনের কোণে একটুকরো শূন্যতা জড়ো হয়ে ছিল? কেন সে কোনোদিন মানতে পারেনি যে—আগুন দেবতাই একমাত্র আরাধ্য ঈশ্বর? সবই এত কাছে, অথচ সবই কত দূরে!

বুকের ভেতর কেমন একটা কাঁপুনি ছড়িয়ে পড়ে মাহবার। ভয়, নাকি সত্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়বার তাড়না? মাহবা বুঝতে পারে না। মনে হয় যেন দূর থেকে কেউ হাত বাড়িতে ডাকছে ‘আয় আয়’ বলে। আবার, খুব কাছ থেকে কেউ যেন টেনে ধরে বলছে—‘যেও না।’

এইসব আলোআঁধারি, চিন্তার নিঃসীম নিমগ্নতার মাঝে মেঘ এসে ঢেকে দিলো আকাশের চাঁদখানাকে। জোসনার অনুপস্থিতি বাইরে একটা গুমোট

আবহ তৈরি করল। কোথায় যেন নড়ে উঠল একটি নিশাচর প্রাণী। মাহবার অপেক্ষার প্রহর কমতে লাগল ধীরে ধীরে।

রাত্রির শেষ প্রহর প্রায় উপস্থিত। আকাশের গাঢ় অন্ধকার ধীরে ধীরে মিইয়ে আসছে। আকাশজুড়ে এখন ফুটে আছে শেষ রাত্রির নক্ষত্রেরা। যেন শাদা শাদা শিউলি ফুলে ভরে আছে রাতের আকাশ। বাতাসে অদ্ভুত ঠান্ডা গন্ধ—অচেনা তবু কী গভীর আবেদনময়। সেই গন্ধে যেন ছড়িয়ে আছে মুক্তির সুবাস।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল মাহবা। বিছানার নিচে সযত্নে লুকিয়ে রাখা সেই শেকল কাটার যন্ত্রটা বের করে আনল। যন্ত্রটা হাতে নিতেই অদ্ভুত অনুভূতি হলো তার—যেন একটা ঠান্ডা শীতল স্রোত বয়ে গেল শরীরজুড়ে। রক্ত হিম করা এই অনুভূতিকে কী বলবে মাহবা—ভয় না মুক্তির আনন্দ?

শেকল কাটার কাজে হাত লাগাল মাহবা। একবার মনে হলো, সে হয়তো পেরে উঠবে না। হাত কাঁপছে তার। বুকের ভেতর কেমন যেন হু হু করে উঠল। মায়ের মুখ, বাবার হাসি, শৈশবের আনন্দ—সব যেন একসাথে হয়ে আঁচড়ে পড়ল মনের বারান্দায়। সকল যাতনা যেন পাহাড়ের মতো বুকের উপর উঠে এলো। কিন্তু, পরক্ষণে মনে হলো, মুক্তির দিশা পেতেই তো সমাজ আর সংসারের সাথে তার এই বিদ্রোহ। তাহলে, কেন এত দ্বিধা আর সংকোচ?

অবশেষে বন্দিত্ব থেকে মুক্ত হলো মাহবা। ঘরের আলোটা যেন সেই মুহূর্তে কেঁপে উঠল। বাতাসের দোলায় দুলে উঠল প্রদীপের শিখা। সেই কাঁপা আলোয় নিজের ছায়াটাকে দেখতে পেল মাহবা—যেন বা এই ছায়াটাই তার নতুন জীবনের প্রথম রাজসাক্ষী।

চুপিসারে দরোজা খুলে বাইরে এসে দাঁড়াল সে। একঝাপটা বাতাস এসে তার গায়ে লাগল। কী স্নিগ্ধ এবং কোমল সেই বাতাস! আঙিনাজুড়ে নক্ষত্রের নিশ্চল আলো খেলা করছে। ঝিরিঝিরি বাতাসে কাঁপছে গাছের পাতা। মাহবা থামল। একবার পেছনে ফিরে দেখে নিলো তার শৈশব আর কৈশোরের ঠিকানাটাকে। এই ঘরদোর, এই উঠোন, মন্দির, গাছপালা—



পরদিন ভোরবেলা, সকালের সূর্য তখনো ভালো মতো উদিতও হয়নি। এমনই আলো-আঁধারির মাঝে কাফেলা পুনরায় রওনা করল। বারদা নদীর তীর ধরে এগুতে লাগল তারা। উটের বহর আগে আগে চলছে। পেছনে সারিবদ্ধভাবে এগুচ্ছে পথিকের দল। মাহবা একবার পেছন ফিরে সাইকামোর বৃক্ষটাকে দেখে নিল। অল্প কয়েকটা মুহূর্তের পরিচয়, তবু এই মহিরুহটা যেন তার কতো আপন হয়ে উঠল! বড় আশ্চর্য মানুষের মন—কখন যে কে আপন হয়ে উঠে আর কে হয়ে যায় পর—তা নির্ণয় করে উঠাই যেন মুশকিল!

চলতে চলতে তারা দামেস্কের উপকণ্ঠে এসে পৌঁছাল। শহরের গির্জা আর মিনারের চূড়াগুলো এখন আরও স্পষ্ট। একটা মুসাফিরখানায় থেমে কাফেলা ইতি টানল তাদের সুদীর্ঘ যাত্রার। শহরে পৌঁছে গেছে তারা। এখান থেকে প্রত্যেকে নিজ নিজ বাসস্থান এবং অঞ্চলের দিকে রওনা করবে।

মধ্যবয়সী সেই লোকটা বিদায় জানাতে এলো মাহবাকে। তার মুখে সেই চিরাচরিত উষ্ণ হাসি। লোকটা মাহবার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল,

‘ভালো থেকো, মাহবা। আমি যেখানেই থাকি না কেন, সর্বদাই তোমার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করব। সৃষ্টিকর্তা নিশ্চয় তোমাকে তোমার কাক্ষিত গন্তব্যে ঠিক ঠিক পৌঁছে দেবেন।’

এত বন্ধুত্বপরায়ণ এবং অভিভাবকসুলভ এই ব্যক্তির সান্নিধ্য এত অল্প সময়ে ফুরিয়ে যাচ্ছে দেখে হুহু করে উঠল মাহবার মন। তবু নিজেকে প্রবোধ দিলো মাহবা। সে জানে—অনন্তের এই যাত্রা কেবল তার একার।

পথে হয়তো এমনই অনেক সঙ্গীর দেখা মিলবে। কিন্তু কেউ তাকে সবটুকু পথ সঙ্গ দিবে না। প্রত্যেকের জীবন আলাদা আলাদা পথের দিকে ধাবিত।

তবু মাহবার চোখ ছলছল। লোকটাকে উদ্দেশ্য করে সে বলল,

‘এই অচিন দেশে আপনার অতি অল্প সময়ের সান্নিধ্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। আপনার প্রতি আমারও অফুরান কৃতজ্ঞতা। যদি অনুমতি পাই, আমি সর্বশেষ একটা জিনিস আপনার কাছে জানতে চাইব।’

শান্ত চেহারার সেই লোকটা বলল,

‘অবশ্যই, মাহবা। বলো, কী জানতে চাও?’

‘পারস্য থেকে কেন আমি এখানে ছুটে এসেছি তা তো আপনি জানেন। আমি চাই সত্যধর্মের খোঁজ, যে ধর্ম আমাকে সৃষ্টিকর্তার সত্যিকার স্বরূপ চেনাবে। অগ্নিপূজার আঁতুড়ঘরে আমার জন্ম এবং বেড়ে উঠা। কিন্তু সেই ধর্ম এবং তার প্রবর্তিত সৃষ্টিকর্তার ধারণার প্রতি আমি কখনোই শ্রদ্ধাবনত হতে পারিনি। আমার সর্বদাই মনে হতো—যে বস্তুকে নিজের হাতে প্রজ্জ্বলিত করে রাখতে হয়, কীভাবে সেই বস্তু আমার সৃষ্টিকর্তা হতে পারে? কীভাবে এটা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আমার জীবন, ইচ্ছা আর ভাগ্যের লিপি? সামান্য কড়িকাঠের অভাবে যে বস্তু নিভে যায়, সেই বস্তু কীভাবে পরিচালনা করতে পারে আকাশের চাঁদ, সূর্য আর গ্রহতারা? নিজ ধর্মবিশ্বাসের প্রতি এমন বিদ্রোহী ভাবনা আজ আমাকে এখানে এনে দাঁড় করিয়েছে। মানুষের জীবন তো খুবই সংক্ষিপ্ত। স্বল্প সময়ের এই জীবন সফরে আমি কোনোভাবেই উদ্ভ্রান্তের মতো এদিকসেদিক ছুটে বেড়াতে চাই না। আমি চাই এমন সাধু সন্ন্যাসীর সান্নিধ্য যারা সত্যিকার সৃষ্টিকর্তাকে চেনেন এবং তার উপাসনা করেন। আমি সেইসব লোকেদের দলে থাকতে চাই যারা সত্যধর্মের উপরে আছেন। আপনি কি দয়া করে আমাকে এমন কোনো লোকের সন্ধান জানাতে পারেন?’



দশটি বছর কেটে যায় এভাবেই।

দিনের পর দিন, ঋতুর পর ঋতু। দামেস্কের আকাশ রঙ বদলায়, বারদা নদীর জল কখনো ফুলে ওঠে, কখনো নামে ধীর শান্ত হয়ে। আনানিয়াস গির্জার ঘণ্টাধ্বনি আগের মতোই বাজতে থাকে—কিন্তু মাহবার ভেতরে আর কোনো পরিবর্তন আসেনি। একদিন অন্ধকারপুরীতে যে অনাবৃত সত্যকে অকস্মাৎ আবিষ্কার করে ফেলেছিল সে—সেই অবিশ্বাস তার হৃদয় থেকে একবিন্দুও সরেনি। সময়ের সাথে সাথে দ্বন্দ্বটা বরং পাথরের মতো ভারী হয়ে বসে গেছে বুকের উপর। এই অনির্ণেয় ভার নিয়েই মাহবা বেঁচে ছিল এতগুলো দিন। কেবল তো বেঁচে থাকাই নয়, এই দ্বন্দ্ব আর অবিশ্বাস বুকে চেপে তাকে পালন করে যেতে হয়েছিল অর্পিত সকল দায়িত্ব। শরীর আর মনের মাঝে সে যে কী সাংঘাতিক লড়াই!

সময়ের আবর্তে বয়স বাড়ে নিউনুসেরও। চুল আর দাড়ি হয়ে উঠে শুভ্র থেকে শুভ্রতর। কণ্ঠস্বরে নেমে আসে আরও কোমলতা, আরও মমতার ছাপ। ভক্ত আর অনুরাগীদের কাছে নিউনুস হয়ে উঠেন আরও পবিত্র, আরও মহান। বয়সের কারণে তার এমন ক্ষয়ে যাওয়া যেন ভক্তকূলের অন্তরে হাহাকার তৈরি করে। মাহবা চুপচাপ সবটাই দেখে। কাউকে কিছু বলে না। নিউনুসের গভীর কালো চোখে সকলে পুণ্যের জলরাশি দেখলেও, মাহবা সেখানে দেখতে পায় নিঃসীম প্রতারণা।

অবশেষে একদিন—খুবই সাধারণ এক কাক ডাকা ভোরে—চিরতরে নিভে গেল নিউনুসের জীবনপ্রদীপ।

না কোনো ঝড়, না কোনো অলৌকিক লক্ষণ। একেবারে সামান্য পেটের অসুখ। আর এই সামান্য জরা কেড়ে নিয়ে গেল নিউনুসের প্রাণবায়ু।

আনানিয়াস গির্জার গুরুগম্ভীর পরিবেশে নেমে আসলো শোকের ছায়া। মুহূর্তেই সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সারাদেশে। চারদিক থেকে বানের জোয়ারের মতো লোকজন আসতে লাগল। কান্না, আহাজারি আর বুক চাপড়ানোর শব্দে ভারী হয়ে উঠল চারপাশ।

শোকের সেই ঢেউ ক্রমেই উঁচু হতে লাগল। আনানিয়াস গির্জার প্রাঙ্গণ আর আশপাশের অলিগলি ভরে উঠল ধীর পদচারণা আর দমবন্ধ করা দীর্ঘশ্বাসে। কোথাও কেউ নিঃশব্দে কাঁদছে, কোথাও আবার উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ। কেউ-বা শেষবারের মতো ছুঁয়ে নিচ্ছে নিউনুসের হাত।

ভক্ত অনুরাগীদের এইসব কান্না আর আহাজারি মিথ্যে কিংবা ভণিতা নয়। তারা সত্যি সত্যিই ভালোবেসেছিল নিউনুসকে। একজন পরহেজগার, দুনিয়াবিমুখ বান্দাকে যতখানি বিশ্বাস করা যায়—তার সবটাই তারা নিউনুসকে করত। কিন্তু হায়! বিশ্বাসের কী সকরুণ প্রতিদান রেখে গেলেন নিউনুস!

মাহবা দাঁড়িয়ে ছিল একটু দূরে, গির্জার এক স্তম্ভের প্রসারিত ছায়ায়। দশ বছরের ভারী নীরবতা তার বুকের ভেতর জমে ছিল পাথরের মতো। আজও সে কাঁদছে না। আজও তার চোখ শুকনো। অথচ আশ্চর্য—বুকের ভেতরে যেন ঝড় বইছে। সেই ঝড়ের শব্দ শোনা যায় না, কিন্তু প্রতিটি শ্বাসে তার অভিঘাত টের পাওয়া যায়। ভক্তদের কান্না, প্রার্থনা, বিলাপ—সবকিছুই তার কানে আসছে দূর থেকে, যেন কোনো গভীর জলরাশির ওপার থেকে ভেসে আসা শব্দ। তার চোখ পড়ে নিউনুসের মুখে। এই মুখটাই কি দশ বছর ধরে মানুষের বিশ্বাসের ভার বইছিল? এই নিখর দেহটাই কি গোপনে কলসের পর কলস সোনা আর রূপার পাহাড় গড়ে তুলেছিল?

তার মনে পড়ল সেই অন্ধকার কক্ষটির কথা। কলসের ঢাকনা উল্টে ধরা সেই মুহূর্ত, ঝিলমিল করে উঠা সেই স্বর্ণ-রৌপ্যের আলো। মনে পড়ল কাঁপা হাতে নিজের আংটি বুঝিয়ে দেওয়া সেই চোখভেজা বৃদ্ধা নারীর কাতর

ঝোলাটা নামিয়ে রাখতে রাখতে সেই বয়স্ক লোকটি বললেন,

‘আপনি খুব সৌভাগ্যবান। এমন একটি দিনে এসে পৌঁছেছেন, যেদিন আমাদের রাহেব তার ছজরা থেকে বের হবেন।’

মাহবার মুখে প্রশান্তির আভা ফুটে উঠল। দীর্ঘ যাত্রা, ক্লান্তি আর অনিশ্চয়তার পর অন্তত অপেক্ষার বোঝা কিছুটা হলেও হালকা হলো।



সত্যকে তুড়ি মেরে অস্বীকার করা যায়, কিন্তু বদলে ফেলা যায় না। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উচ্চারণ করা সত্যকেও মক্কার অভিজাতরা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিতে চেয়েছিল। তারা ভেবেছিল, উপহাস আর অবজ্ঞার মাধ্যমেই তারা ঢেকে দিবে সত্যকে; কিন্তু পারল না। বংশগৌরবে অন্ধ হয়ে থাকা উচ্চ বংশীয়রা যখন আল্লাহর রাসুলকে অপদস্থ করায় ব্যস্ত, তখন অপেক্ষাকৃত গরিব, দীন এবং নির্যাতিত মানুষদের মনে নবিজির আস্থান দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়তে লাগল। একের পর এক মানুষ এসে ভিড় জমাচ্ছিল ইসলামের ছায়াতলে। মক্কার বাতাসে ধীরে ধীরে স্পষ্ট হতে শুরু করল পালাবদলের এক অদৃশ্য সমীকরণ।

কুরাইশেরা সব পথেই চেষ্টা করল নবিজিকে থামাতে। নির্যাতিনের কোনো ধরনই বাদ গেল না। মুসলমানদের ওপর নেমে এলো অত্যাচার, নিষ্পেষণ আর বর্জনের খড়গ। অনেককেই মক্কা ছাড়তে হলো, অনেককে হতে হলো গৃহহীন। তবু কাউকে দমানো গেল না। বরং অত্যাচারের তীব্রতা যত বাড়ে, তাদের ঈমানও যেন তত প্রকট হয়।

আল্লাহর রাসুলের আনীত বাণী, তাঁর শান্ত অথচ অটল দাওয়াত—এসবের মধ্য দিয়ে মক্কা যেন নীরবে ঘটে যাচ্ছিল এক বিপ্লব। শুরুতে যারা তাঁর

ডাকে সাড়া দিয়েছিল, তারা ছিল দুর্বল আর দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সম্ভ্রান্ত ঘরের লোকেরাও ইসলামের দিকে ঝুঁকতে শুরু করল। তাদের মধ্যে ছিলেন রাসুলের চাচা হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব এবং উমার ইবনুল খাতাব রাদিয়াল্লাহু আনহু। এই দুজনের ইসলাম গ্রহণ কুরাইশদের ভীত করে তুলল সবচেয়ে বেশি।

ইসলামের খুঁটিগুলো ধীরে ধীরে শক্ত হতে লাগল। মুসলমানরা আত্মবিশ্বাস ফিরে পাচ্ছে, কোথাও কোথাও গড়ে তুলছে প্রতিবাদ আর প্রতিরোধও। কুরাইশের নেতারা বুঝে ফেলল—এই স্রোত আর তাদের নিয়ন্ত্রণে নেই। এখনই কিছু না করলে, তাদের বাপ-দাদার ধর্ম, বংশীয় দম্ভ আর ক্ষমতার কাঠামো—সবকিছুই তাদের ঘরের মতো ভেঙে পড়বে।

তারা বসল শলা পরামর্শ করতে। কী করা যায়, কোন উপায়ে থামানো যায় আবদুল্লাহর পুত্র মুহাম্মাদকে? একেকজন একেক পরামর্শ দিলো। কিন্তু তেমন কার্যকর কোনো সমাধান উঠে আসলো না। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হলো—আবু তালিবের শরণাপন্ন হতে হবে। তিনি বয়োজ্যেষ্ঠ এবং অত্যন্ত সম্মানিত। কুরাইশ গোত্রে এমন কেউ নেই যারা তাকে সমীহ করে না। তাছাড়া মুহাম্মাদের অভিভাবকও তিনি। ফলে, তার মধ্যস্থতাতেই একটা কার্যকর সমাধানে পৌঁছানো সম্ভব।

কুরাইশ নেতা আবু তালিবের মধ্যস্থতায় তারা কিছু প্রস্তাব পেশ করল। তারা বলল,

‘হে মুহাম্মাদ, কী চাও তুমি? ধনসম্পদ, অর্থকড়ি যা চাও দেবো। ক্ষমতা চাও? তোমাকে আমরা আমাদের নেতা বানিয়ে রাখব। যদি চাও তো—আরবের সবচেয়ে সুন্দরী নারীর সাথে তোমার বিবাহ দেবো। তবুও আমাদের মানুষগুলোকে বিভ্রান্ত করো না। আমাদের বাপ-দাদাদের ধর্ম থেকে বিমুখ করো না লোকজনকে।’

আবু তালিব গভীর মনোযোগ দিয়ে কুরাইশ নেতাদের কথা শুনলেন। কুরাইশদের সেই দলে ছিল উতবা ইবনু রাবিআ, আবু সুফিয়ান ইবনু হারব, আবুল বাখতারি আস ইবনু হিশাম, আসওয়াদ ইবনুল মুত্তালিব

ইবনি আসাদ, আবু জাহল আমার ইবনু হিশাম ইবনি মুগিরা, ওয়ালিদ ইবনুল মুগিরা-সহ অনেকে। বয়সের ভারে নুয়ে পড়া আবু তালিবের চোখে তখন দুশ্চিন্তার ছায়া। তিনি খুব ভালো করেই জানেন—এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার অর্থ হলো কুরাইশদের রোষকে আরও উসকে দেওয়া। মুহাম্মাদকে দমাতে তারা যেকোনো কাজই করে বসতে পারে। এমনকি প্রিয় ভাতিজার প্রাণ সংহার করতেও কুঠাবোধ করবে না।

আবু তালিব নবিজিকে ডেকে পাঠালেন। নবিজি উপস্থিত হলে কুরাইশ নেতাদের সব প্রস্তাব আর তাদের সম্ভাব্য হিংস্রতার আভাস দিতেও বাকি রাখলেন না। সবকিছু খুলে বলার পর নিজের অপারগতাকে টেনে আবু তালিব বললেন,

‘আমার প্রিয় ভাতিজা, আমি তোমাকে অন্তর থেকে ভালোবাসি। কিন্তু জীবন সায়াহ্নে দাঁড়িয়ে, কুরাইশদের সাথে তোমার হয়ে লড়াই করার মতো পর্যাপ্ত শক্তিও আমার নেই। তাই আমি বলি—তুমি বরং ওদের প্রস্তাবটা মেনে নাও। এতে তুমি ওদের রোষানল থেকে বাঁচবে, আমার বুকের দুশ্চিন্তাও কিছুটা হালকা হবে।’

এই প্রথম চাচা আবু তালিবের মুখে হতাশার সুর শুনলেন নবিজি। দাদার ইন্তেকালের পর যে মানুষটি তাঁর মাথার উপরে ছায়া হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, আজ সেই ছায়াও যেন ধীরে ধীরে সরে যেতে লাগল। দুনিয়ার সকল তিরস্কার, সকল অপবাদ সহ্য করা যায়, কিন্তু প্রিয় চাচার এই অসহায়তা সহ্য করা বড় কঠিন।

আবু তালিবের সামনে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন নবিজি। চোখের পানিতে তাঁর বুক ভেসে যায়। সেই অশ্রুসিক্ত চোখেই তিনি বললেন,

‘চাচাজান, আল্লাহর কসম! যদি তারা আমার ডান হাতে সূর্য আর বাম হাতে আকাশের চাঁদও এনে দেয়—তবু আমি এই সত্য প্রচার থেকে একবিন্দু সরে দাঁড়াব না। যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করেন অথবা এই পথেই আমার প্রাণ চলে যায়।’